ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ৮১-৯৬
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4107

হাশেম আলী খানের জীবন ও রাজনীতিঃ ১৯১৪-১৯৩৬

ড. মোহাম্মদ আবদুল বাতেন চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যাল

Abstract: The main political strength of Hashem Ali Khan was the peasant class of Bengal. At the beginning of the 20th century, when the people of Bengal were disoriented by the exploitation of the British and the tyranny of the zamindar and money-lenders, like in other regions, the Krishak-Praja movement was formed under the leadership of Hashem Ali Khan in Barishal. His role is particularly notable in Barishal region for various anti-British movements like anti-Partition Movement, Non-cooperation Movement, Khilafat Movement, Satyagraha Movement and movement against Kulkathi massacre. He led various organizations including Bengal Congress, Muslim League, Khilafat Committee, and Krishak-Praja Party in Barishal for almost forty-eight years. As a member of the Bengal Provincial Legislature for about 12 years, Hashem Ali Khan participated in various legislation and debates. This article looks into and analyses the political activities of Hashem Ali Khan in Barishal District between the years 1914 to 1936.

Key Words: Hashem Ali Khan, Congress, Kulkathi Massacre, Barishal District Board.

ভূমিকা: ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি যখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আবর্তিত হচ্ছিল তখন বরিশালে[১] যে ক্ষণজন্মা মানুষটি নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের কল্যাণে রাজনীতি শুরু করেন তিনি হলেন হাশেম আলী খান। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় বরিশাল জেলা স্কুলের ছাত্র অবস্থায় মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক চেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণের সূত্রে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়ে অল্পকালের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ[২] গঠিত হলেও পূর্ব বঙ্গের জেলা শহরে তখনও এর ভিত্তি গড়ে ওঠেনি। সর্বভারতীয় সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস এ সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়। বরিশালে পূর্ণাঙ্গ কংগ্রেস[৩] কমিটি গঠন না

হলেও "বরিশাল জনসভা" এবং "বরিশাল স্বদেশ বান্ধব সমিতি"র ব্যানারে কংগ্রেস কর্মীরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। এমনি সময়ে ১৯১৪ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কোর্টের আইন ব্যবসা ত্যাগ করে হাশেম আলী খান বরিশাল বারে[৪] যোগ দেন। তখন থেকে হাশেম আলী খান কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। কিন্তু কংগ্রেস ছিল মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংগঠন। এ অবস্থায় বাংলার অবহেলিত কৃষক সমাজের মুক্তি কংগ্রেসের মাধ্যমে সম্ভব ছিলনা। তাই তিনি ১৯১৫ সালে বরিশালে কৃষক-প্রজা সমিতি গঠন করেন।[৫] ১৯২০ সালে হাশেম আলী খান বরিশাল জেলা খেলাফত কমিটির সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯২১ সালে তিনি মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে গঠিত বরিশাল জেলা কংগ্রেসের বিভাগীয় সম্পাদক নির্বাচিত হন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি বরিশাল জেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। নির্যাতিত কৃষকদের মুক্তি অর্জন ছিল তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য। ১৯২১ সালে বরগুনার গৌরীচন্নায় এবং ১৯৩০ সালে গৌরনদীর আগৈলঝাড়ায় অনুষ্ঠিত দুটি বৃহৎ কৃষক সম্মেলন তারই সাক্ষ্য বহন করে। প্রকৃতপক্ষে ত্রিশের দশকে হাশেম আলী খানের নেতৃত্বে বরিশাল অঞ্চলে কৃষক-প্রজা সমিতি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হাশেম আলী খান ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে তিনি কৃষক-প্রজা পার্টির বরিশাল জেলা সভাপতি নির্বাচিত হন। কৃষক-প্রজা পার্টির সমর্থনে ১৯৩৬ সালে তিনি বরিশাল জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হন।[৬]

গবেষণা পদ্ধতি

১৯১৪-১৯৩৬ কালপর্বে বরিশাল জেলায় হাশেম আলী খানের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিরূপণ করা বর্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটিতে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম সংক্রান্ত প্রকাশিত পুস্তক, জার্নাল, সাময়িকপত্র, প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, সংকলিত পুস্তক, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত বঙ্গীয় আইন সভার কার্যবিবরণী প্রভৃতি হতে যাচাই বাছাই করে আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে বর্তমান প্রবন্ধটি লেখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক জীবন

১৮৮৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গত স্বরূপকাঠী থানার সেহাঙ্গল গ্রামে হাশেম আলী খান জন্মগ্রহণ করেন।[৭] তাঁর পিতার নাম আরমান আলী খান এবং মাতার নাম পেয়ারবানু। হাশেম আলী খান ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। পারিবারিক প্রথা অনুয়ায়ী তিনি বাড়ির মক্তবে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। মক্তবের পণ্ডিত ছিলেন কৃষ্ণ কান্ত বসু। মক্তবে একজন মৌলভিও ছিলেন যার কাছ থেকে তিনি আরবি ও ফার্সি শিক্ষা লাভ করেন। হাশেম আলী খান ১৮৯৮ সালে সামুদেকাঠী

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেয়ে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষা এবং ১৯০০ সালে জুলুর্হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাসিক চার টাকা বৃত্তি পেয়ে ৫ম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০১ সালে জুলুর্হাট স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে কিছুদিন পরে তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে[৮] পুনরায় ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। বরিশাল জেলা স্কুলের ছাত্র হিসেবে তিনি গীর্জামহলা রোডে অবস্থিত বেল ইসলামিয়া হোস্টেলে[৯] থাকতেন। এ সময় তিনি হোস্টেলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিনের[১০] কাছাকাছি আসার সুয়োগ পান। তৎকালীন সময়ে বরিশাল জেলা স্কুলে প্রায় ছয়শত ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০/২৫ জন। হাশেম আলী খান শুধু মেধাবী ছাত্রই ছিলেন না খেলাধুলা, নাটক ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েও তিনি প্রশংসা অর্জন করেন; ১৯০৬ সলে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে হাশেম আলী খান কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স পাশ করে মাসিক দশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর পারিবারিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় এফ এ ক্লাসে ভর্তি হন। এ মাদ্রাসা থেকে ১৯০৮ সালে তিনি এফ এ এবং ১৯১০ সালে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। হাশেম আলী খান ছিলেন বরিশাল জেলার চতুর্থ মুসলিম গ্র্যাজুয়েট।[১১] ১৯১০ সালে বি.এ. ডিগ্রি লাভের পর পরই তিনি কলকাতা মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল এবং একই সাথে বিখ্যাত বেকার হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। এ সময় তাঁর নেতৃত্বে গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের বিনামূল্যে বই প্রদান এবং স্বল্প বেতনে পড়াশুনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে "ডিউটি ফান্ড" নামে একটি তহবিল চালু করা হয়। ফলে এ প্রতিষ্ঠান হতে অনেক গরিব ও মেধাবী ছাত্র উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। ১৯১৩ সালে তিনি রিপন কলেজ হতে আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সী কোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। হাশেম আলী খান কলকাতা প্রেসিডেন্সী কোর্টের আইন ব্যবসা ত্যাগ করে ১৯১৪ সালে বরিশাল বারে যোগ দেন।

কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা

১৯১৪ সালে হাশেম আলী খান বরিশাল বারে যোগদান করে প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তবে এরও আগে ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় হাশেম আলী খানের রাজনৈতিক মানস ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। বরিশাল ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের এক উর্বর ক্ষেত্র। মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালের স্বদেশি আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তাই সিদ্ধান্ত হয় ১৯০৬ সালে বরিশালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের বার্ষিক প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।[১২] সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে প্রায় তিনশত ছাত্রের সমন্বয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে অধিনায়ক হিসেবে হাশেম আলী খান যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনে যোগদানের

উদ্দেশ্যে ১৩ এপ্রিল খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমারযোগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, আবদুল হালিম গজনবী, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ভূপেনচন্দ্র বসু, মতিলাল ঘোষ, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু প্রমুখ নেতা বরিশালে এসে পৌঁছেন। ১৪ এপ্রিল সম্মেলনের সভাপতি ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের নেতৃত্বে শহরে শোভাযাত্রা বের হয়। সরকারি নিষেধ অমান্য করে শোভাযাত্রা থেকে বন্দে মাতরম ধ্বনি উচ্চারিত হলে গুর্খা পুলিশ শোভাযাত্রার ওপর লাঠিচার্জ চালায় এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে গ্রেফতার করে। এসময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে হাশেম আলী খানও গ্রেফতার হন। ১৯০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ২২ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। হাশেম আলী খান তখন কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্র। এ সম্মেলনেও তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে যোগদান করেন। কংগ্রেসের বরিশাল জেলা কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত "বরিশাল জনসভা" ও "বরিশাল স্বদেশ বান্ধব সমিতি" কংগ্রেসের বিকল্প ভূমিকা পালন করতো।[১৩] বরিশালে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ছিলেন কংগ্রেসের একক নেতা। হাশেম আলী খান তাঁর অনুপ্রেরণায় ও সহযোগিতায় বরিশালের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হন।

নাগপুর কংগ্রেসের পর ১৯২১ সালের মার্চ মাসে বরিশালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন অশ্বিনী কুমার দত্ত। সম্পাদক হন শরৎ কুমার গুহ এবং যুগ্ম সম্পাদক হলেন হাশেম আলী খান। প্রাদেশিক সম্মেলনের পর বরিশালে কংগ্রেসের প্রথম জেলা কমিটি গঠিত হয়। মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত সভাপতি, দেবকুমার রায় চৌধুরী সেক্রেটারি এবং হাশেম আলী খান, প্যারিলাল ও দীনবন্ধু সেন বিভাগীয় সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাংগঠনিক প্রতিভার জন্য একই সাথে হাশেম আলী খানকে বরিশাল জেলা কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক ও প্রচার দপ্তরের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রাদেশিক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী এক বাণীতে বলেন "যখন সমস্ত ভারত গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল তখন বরিশাল ছিল সদাজাগ্রত।" ১৯২১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী এবং মওলানা মোহাম্মদ আলী স্টিমার যোগে বরিশাল আগমন করলে ১৭০০ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হিসেবে হাশেম আলী খান উভয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানান। বিএম স্কুল মাঠে মহাত্মা গান্ধীর হিন্দি ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর উর্দু বক্তৃতা হাশেম আলী খান বাংলায় অনুবাদ করে উপস্থিত জনতাকে শোনান যা ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২২ ভাদ্র বরিশাল *হিতৈষি* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কৃষক-প্রজা পার্টির সাথে সম্পৃক্ততা

হাশেম আলী খান ছাত্রজীবন থেকেই কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতি অনেকটা জমিদারপুষ্ট হওয়ায় হাশেম আলী খান শংকিত হয়ে ওঠেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের বিশাল কৃষক সমাজকে

বাদ দিয়ে কোন রাজনীতি সম্ভব নয়। তাছাড়া সে সময় নির্যাতিত কৃষকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে কৃষক-প্রজাদেরকে সংঘবদ্ধ করার মতো শক্তিশালী পৃথক কোন সংগঠনও ছিল না। তাই কলকাতা ত্যাগ করার পূর্বেই তিনি বরিশালে আইন ব্যবসার পাশাপাশি অত্যাচারিত কৃষকদের নিয়ে নতুন সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। কলকাতায় অবস্থান করলে যে যশ ও খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন তা বাদ দিয়ে তিনি ১৯১৪ সালে অবহেলিত কৃষক সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই নিজ মাতৃভূমি বরিশালে প্রত্যাবর্তন করেন।

বাংলায় প্রজা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে প্রজাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন সম্মেলনের আয়োজন করা হতো। স্থানীয় সমাজ সচেতন ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় আয়োজিত এ সমস্ত সম্মেলনে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হতো।[১৪] ১৯১৪ সালে জামালপুর জেলার কামারের চরে স্থানীয় প্রজা নেতা খোশ মোহাম্মদ সরকারের উদ্যোগে এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের আহ্বানে এক কৃষক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। কামারের চরের সম্মেলনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বরিশালের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় প্রজা নেতা হাশেম আলী খান অনুরূপ সম্মেলনের আয়োজন করেন। কিন্তু বরিশালের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল পশ্চাৎপদ। একদিকে বরিশালে কোনো রেল যোগাযোগ ছিল না; অন্যদিকে স্টিমার সার্ভিসও ছিল অপর্যাপ্ত এবং অনুন্নত। ফলে ঢাকা থেকে নৌকাযোগে সেখানে পৌঁছতে পাঁচ থেকে ছয়দিন সময় লাগতো। এ অবস্থায় বরিশালের প্রজা সম্মেলনগুলো নিখিল বঙ্গীয় রূপ লাভ সম্ভব ছিল না।[১৫] তবে এ সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও বরিশালের প্রজাদেরকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা

বরিশালের মুসলমান সম্প্রদায় মওলানা মুহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর আহ্বানে খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এ সময়ে তরুণ রাজনীতিবিদ হাশেম আলী খান বরিশালের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানান। খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিনের সভাপতিত্বে হাশেম আলী খান বরিশালে এক সভার আয়োজন করেন। ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানরা এ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে বরিশাল জেলা খেলাফত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন এবং সম্পাদক হন হাশেম আলী খান।[১৬] এদিকে বরিশালে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। অশ্বিনী কুমার দত্তের অসুস্থতার কারণে হাশেম আলী খান ও শরৎকুমার ঘোষ আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলেন। হাশেম আলী খানের অনলবর্ষী বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ এবং আইনজীবীগণ

আদালত বর্জন করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মচারিও চাকরি ত্যাগ করে আন্দোলনে অংশ নেন।

অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে ১৯২১ সালের মে মাসে পিরোজপুর ন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনন্ত প্রসাদ সেনগুপ্তসহ কয়েকজন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদে ১৩ মে পিরোজপুর শহরে হরতাল পালিত হয়।[১৭] পিরোজপুরে সংগঠিত অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ১৯২১ সালের ১৯ মে *অমৃতবাজার* পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়:

> পিরোজপুর মহকুমায় অহিংস অসহযোগের আন্দোলন বেশ ভালোভাবেই প্রসার লাভ করছে। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে প্রায় শ-খানেক সভা করা হয়েছে। স্থানীয় ধামাধরার দল অসহযোগের বিরুদ্ধে এক সভা ডেকেছিল। কিন্তু যারা ডেকেছিল, তারা অবাক হয়ে দেখল যে তাদের সে সভা অসহযোগের পক্ষপাতী সভা হয়ে উঠল। পিরোজপুরে দুটো জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ছাত্রসংখ্যাও প্রচুর হয়েছে। স্থানীয় বহু উকিল-মোক্তার আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন।[১৮]

অতঃপর পিরোজপুরের এ গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৮ মে বরিশালে এবং ১৯ মে ভোলায় হরতাল পালিত হয়। হাশেম আলী খান বরিশাল শহরে কয়েকটি জনসভা করে জনগণকে স্বদেশি পণ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর নিজ গ্রাম স্বরূপকাঠী থানার সেহাঙ্গঁলে জনসভা করে তিনি কৃষক সমাজকে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে হাশেম আলী খানের বিরুদ্ধে লিগ্যাল প্রাকটিশনার অ্যাক্ট অনুসারে মামলা দায়ের করা হয় এবং একই সাথে তাঁর আইন পেশার সনদপত্র সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়।[১৯] ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে গুর্খা পুলিশ বরিশাল জেলায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রায় পাঁচশত নেতা-কর্মীকে বন্দী করে। বরিশাল জেলের জেল সুপার ডা. মেজর মনরো বন্দীদের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালান। এর প্রতিবাদে সতীন্দ্র নাথ সেন বরিশাল জেলে প্রায় ৬১ দিন অনশন করেন। হাশেম আলী খানসহ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাকে বাঁচানোর জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান। এমন অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ডা. মেজর মনরোকে বরিশাল জেল সুপারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়। অতঃপর সতীন্দ্র নাথ সেন অনশন প্রত্যাহার করে নেন।

স্টিমার ধর্মঘট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা

বিহার প্রদেশের বহু কুলি করিমগঞ্জের চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো। ১৯২১ সালের ১৪ ও ১৫ মে তারা বিহারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে চাঁদপুর স্টিমার ঘাটে এসে সমবেত হয়। চা-শ্রমিকরা বিনা ভাড়ায় স্টিমারে যেতে চাইলে স্টিমার কোম্পানি তাতে আপত্তি জানায়। ক্রমশঃ পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠে। এরূপ পরিস্থিতিতে ২০ মে গুর্খা পুলিশ উত্তেজিত চা-শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। এতে বহুসংখ্যক শ্রমিক খুন ও জখম হয়। এর প্রতিবাদে চাঁদপুর ও বরিশালে স্টিমার ধর্মঘট আরম্ভ হয়। কলকাতার পর বরিশাল

ছিল স্টিমার কোম্পানির দ্বিতীয় প্রধান ডক। অশ্বিনী কুমারের বাড়ীতে ডকে কাজ করে এমন স্টিমার কুলি এবং কর্মচারীদের এক সভা আহ্বান করা হয়। স্ট্রাইক পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটির সভাপতি মনোনীত হন অশ্বিনী কুমার দত্ত এবং সম্পাদক হন হিরালাল দাশগুপ্ত। হাশেম আলী খান ছিলেন এ ধর্মঘটের অন্যতম নেতা।[২০]

আইনজীবী হিসেবে হাশেম আলী খান

হাশেম আলী খান ১৯১৪ সালে বরিশাল বারে যোগ দেন। তাঁর আইন ব্যবসা ও রাজনীতি ছিল যুগপৎ এবং উভয় ক্ষেত্রে কৃতিত্বও ছিল সমমাত্রায়। বরিশাল বারে যোগদানের অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তীক্ষ্ম বুদ্ধি, অসাধারণ বাগ্মিতা ও প্রকাশভঙ্গি তাঁকে স্বল্প সময়ের মধ্যে বরিশালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। আইনজীবী হিসেবে হাশেম আলী খানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি জমিদার, তালুকদার এবং অভিযুক্ত পুলিশ কর্মচারির বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজাদের পক্ষে মোকদ্দমা গ্রহণ করতেন। অবিভক্ত বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী বারিশালের "আমজাদ-অরুণ বালা" এবং "মহী-শোভনার" ঐতিহাসিক মামলা দুটি হাশেম আলী খানকে সারা ভারতে খ্যাতিমান করে তোলে। বরিশালের কুখ্যাত "কুলকাঠি হত্যাকাণ্ড" মামলায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সাথে তিনিও আইনি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এছাড়াও "গুনাই বিবি", "জরিনা সুন্দরী" ইত্যাদি মামলায় তার সুনাম অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার বাইরেও তিনি ভারতের মোজাফ্ফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও বিহার প্রভৃতি স্থানে মামলা পরিচালনা করে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন।[২১]

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা

১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সনাতন ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হয়। পটুয়াখালী ছিল বরিশাল জেলায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। পটুয়াখালীতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলে ১৯২৩ হতে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত।[২২] বরিশাল জেলায় এই আন্দেলনের প্রধান নেতা ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক সতীন্দ্রনাথ সেন। ১৯২৩ সালে পটুয়াখালীর লতিফ সেমিনারী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে কালী পূজাকে কেন্দ্র করে বিরোধের সূত্রপাত হয়। যেহেতু মুসলমান ছাত্ররা স্কুলে কোরবানি দিত না, তাই তারা বিদ্যালয়ে পূজার বিরোধিতা করে। তবুও হিন্দু ছাত্ররা পূজা দিলে রাতের অন্ধকারে কিছু লোক দেবীর সামনে গরুর মাথা রেখে আসে। ঘটনাটি শহরের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি করে। এছাড়া পূজার সময় হিন্দুরা মসজিদের সামনে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দিতে চায়, কিন্তু মুসলমানরা এর বিরোধিতা করে। পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানা রকম চেষ্টা চালায়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বরিশালের কংগ্রেস ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসেন। উদারপন্থী অনেক কংগ্রেস কর্মী সতীন্দ্রনাথ সেনের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরোধিতা করে। কংগ্রেস

ও প্রজা সমিতির নেতা হাশেম আলী খান এই সংঘাত বন্ধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বরিশাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই.এন. ব্লান্ডির অনুরোধে তিনি উভয় দলের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন, কিন্তু ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পোনাবালিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন বন্ধ করার জন্য হীরালাল দাশগুপ্ত, রবি রায়, দেবেন দত্ত, আশু মুখার্জী, কৃষ্ণ মুখার্জীসহ সতীন্দ্র নাথ সেনকে গ্রেপ্তার করে। অবশেষে হাশেম আলী খানের উদ্যোগে ১৯২৮ সালে বরিশাল চুক্তির মাধ্যমে পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ হয়। ১৯২৫-২৬ সালের *Bengal Administrative Report* এ পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে রির্পোট প্রকাশিত হয়।[২৩]

কুলকাঠি হত্যাকাণ্ড

বরিশালের কুলকাঠি হত্যাকাণ্ড[২৪] উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের একটি কলংকময় অধ্যায়। কুলকাঠি হত্যাকাণ্ড বরিশালের মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। পোনাবালিয়ার শিব লিঙ্গ ভারত বিখ্যাত ছিল। প্রাচীনকাল হতে এখানে পূজা হতো এবং শিবরাত্রে পূজা উপলক্ষে মেলাও বসত। কিন্তু ১৯২৬-২৭ সালে পোনাবালিয়া সংলগ্ন কুলকাঠি গ্রামে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মৌলভী সৈয়দ উদ্দিন কুলকাঠি মসজিদের ইমাম ছিলেন। ১৯২৭ সালে মৌলভী সৈয়দ উদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলমানরা মসজিদের সামনে দিয়ে পূজার শোভাযাত্রায় বাধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে স্থানীয় হিন্দুরা বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক সতীন্দ্রনাথ সেনের শরণাপন্ন হন। সতীন্দ্র নাথ সেন তরুণ সংঘের একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে কুলকাঠি গমন করেন। পরিস্থিতি মোকাবেলায় বরিশাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই.এন.ব্লান্ডি, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মি. টেলর ও বরিশাল সদর এস.ডি.ও. জিকে বিশ্বাস ১৯২৭ সালের ২ মার্চ একদল গুর্খা সৈন্য নিয়ে কুলকাঠি উপস্থিত হন। মি. ব্লান্ডি উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে ব্যর্থ হন এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি গুর্খা পুলিশকে গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। এর ফলে ঘটনাস্থলেই ১৯ জনের মৃত্যু হয়।[২৫] পোনাবালিয়ার ঘটনায় নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সাহায্যের জন্য খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমেদকে সভাপতি করে একটি রিলিফ ফান্ড গঠিত হয়।

কুলকাঠির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বরিশালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার আশংকা দেখা দেয়। উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে বরিশালের এ.কে. স্কুল প্রাঙ্গনে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন ও হাশেম আলী খান বক্তব্য রাখেন।[২৬] হাশেম আলী খান এ ঘটনার জন্য দায়ী বরিশাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ব্লান্ডি ও পুলিশ সুপার মি. টেলরকে অবিলম্বে অপসারণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ ও হাশেম আলী খানের নেতৃত্বে এক শোভাযাত্রা বরিশাল শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। কুলকাঠি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার

জন্য বেশ কয়েকটি সংগঠন গড়ে ওঠে। খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমেদকে সভাপতি এবং আবদুল ওহাব খানকে সম্পাদক করে মুসলিম সমিতি এবং কুলকাঠি শহিদদের স্মরণে শহীদ ভলান্টিয়ার সমিতি গঠন করা হয়। শহীদ ভলান্টিয়ার সমিতির প্রধান ছিলেন উকিল হাফিজ উদ্দীন আহমেদ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য জেলা তরুণ আনছার সমিতি গঠন করা হয়। হাশেম আলী খান ছিলেন আনছার সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন উত্তর শাহবাজপুরের আবুল হাশেম। এছাড়া আন্দোলন পরিচালনা এবং মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বরিশালে গঠিত হয় District Mohamadan Association। খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতি এবং হাশেম আলী খান সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।[২৭] কুলকাঠি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ এবং হাশেম আলী খানের প্রচেষ্টায় ১৯২৭ সালের মে মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত বরিশালে প্রাদেশিক মুসলিম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ. কে. স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন স্যার আবদুর রহিম এবং অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন হাশেম আলী খান। সম্মেলনকে সফল করার জন্য যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয় তার সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ এবং সম্পাদক ছিলেন হাশেম আলী খান।[২৮] কুলকাঠির ঘটনার পর নতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মি. ডনোভন নিযুক্ত হন। তিনি বরিশালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান বিবাদ দূর করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হাশেম আলী খানের মাধ্যমে মি. ডনোভন ১৯২৮ সালের ২৫ জুলাই বরিশাল জেলা বোর্ডে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। হাশেম আলী খানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে একটি সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন এবং উভয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[২৯] জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডনোভন চুক্তিনামায় সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী সরকার পক্ষের আনীত সকল মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং সতীন্দ্রনাথ সেন মুক্তি লাভ করেন। বরিশালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

কৃষক-প্রজা আন্দোলন ও হাশেম আলী খান

হাশেম আলী খান জমিদার মহাজনদের নিষ্ঠুর অত্যাচার হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ না হলে কৃষক-প্রজার মুক্তি নেই। তাই মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের রাজনীতির মাধ্যমে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ সম্ভব নয় বলেই তিনি স্থানীয় কংগ্রেসের নেতা হয়েও প্রজা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। আগৈলঝাড়া সম্মেলনে কৃষক-প্রজার উপস্থিতি দেখে জমিদার, তালুকদার ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে পড়েন। তারা এ সম্মেলনকে ব্যর্থ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান। সরকার ও স্থানীয় মুসলমানদের কোনো কোন মহল তাঁকে আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। বরিশালের

তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ওয়াভেল তাঁকে বহুবিধ প্রলোভন দেখিয়ে আন্দোলন থেকে সরে আসার আহ্বান জানান। কিন্তু কৃষক দরদি হাশেম আলী খান কোন প্রলোভনের কাছেই নতি স্বীকার করেননি।

১৯২১ সালে গৌরনদীর আগৈলঝাড়ায় অনুষ্ঠিত প্রজা সম্মেলন প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।[৩০] এ সম্মেলন আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন স্থানীয় কৃষক নেতা ভেগাই হালদার। হাশেম আলী খানের আহ্বানে তরুণ বিপ্লবী ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মীরা সম্মেলনকে সফল করার জন্য সহযোগিতা করেন। পটুয়াখালীর বাণীকণ্ঠ সেন, খাদেম আলী মৃধা, কলসকাঠির হাশেম আলী তালুকদার, কসবার মাজেদ কাজীর নেতৃত্বে হাজর হাজার হিন্দু নমঃশুদ্র এবং মুসলমান কৃষক-প্রজা আগৈলঝাড়া সম্মেলনে যোগদান করে। প্রায় পাঁচ হাজার মহিলাও উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তফসিলি নেতা ললিত কুমার বল ও যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল ছিলেন সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হাশেম আলী খান। সভাপতির ভাষণে তিনি প্রজা সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে কৃষকদের জমিদার ও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। সভায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও মহাজনী শোষণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগৈলঝাড়ার এ কৃষক সম্মেলন বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

১৯২৪ সালে ঢাকায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হাশেম আলী খানসহ বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন এবং এ সম্মেলনে নিখিল বঙ্গ প্রজা-সমিতি গঠন করা হয়। ১৯২৬ সালে মানিকগঞ্জের ঘিওর হাটে আয়োজিত হয় বিরাট প্রজা সম্মেলন। পাবনা, টাঙ্গাইল ও ঢাকা থেকে হাজার হাজার কৃষক এ সম্মেলনে যোগ দেন। বরিশালের কৃষক নেতা হাশেম আলী খান এ সম্মেলনে ভাষণ দেন।[৩১] মানিকগঞ্জের এ কৃষক সম্মেলন বাংলার কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের সূচনা করে। ১৯২৯ সালে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে জামালপুরের শাহ আবদুল হামিদের পরামর্শে এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের প্রস্তাবে প্রজা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য "নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩২] সভায় উপস্থিত পরিষদ সদস্যদের মধ্যে ১৮ জন নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করেন। স্যার আবদুর রহিম এ সমিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খাঁ সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। বরিশাল থেকে হাশেম আলী খান এ সম্মেলনে যোগদান করেন এবং কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯২৯ সালে কলকাতা সম্মেলনের পর প্রজা সমিতির জেলা সংগঠনগুলো পুনর্গঠন করা হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজা সমিতি সমূহ ঐক্যবদ্ধ সংগঠনে পরিণত হয়। হাশেম আলী খান বরিশাল জেলার প্রজা সমিতি পুনর্গঠন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে

তিনি জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।[৩৩] একই সাথে উকিল সৈয়দ হাবিবুর রহমান সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি বরিশাল জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও থানা প্রজা সমিতিগুলো গঠন করেন। ১৯৩০ সালে বরগুনার গৌরিচন্নায় হাশেম আলী খানের সভাপতিত্বে বিশাল প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৩৪] গৌরিচন্নায় ঢাকার নবাবের কাছারি ছিল। নবাবদের অত্যাচারে প্রজারা ছিল অতিষ্ঠ। তাই প্রজা সমিতির নেতৃবৃন্দ সম্মেলনের জন্য গৌরিচন্নাকে বেছে নেন। বামনা, মঠবাড়িয়া, পাথরঘাটা, বেতাগী, বরগুনা ও আমতলী থেকে হাজার হাজার কৃষক এ সম্মেলনে যোগ দেয়। সভায় হাশেম আলী খানের বক্তৃতা শুনে অবহেলিত কৃষক সমাজ অনুপ্রাণিত হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও খাজনা হ্রাস করতে হবে। মঠবাড়িয়ার হাতেম আলী জমাদ্দার, পাথরঘাটার তাহের উদ্দীন হাওলাদার, বেতাগীর আর্শেদ হাওলাদার ও বরগুনার লালমিঞা প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনকে তীব্র করে তোলেন।

বঙ্গীয় আইনসভায় হাশেম আলী খান

১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের শেষ নির্বাচন। পশ্চিম বরিশাল নির্বাচনী এলাকায় কৃষক-প্রজা সমিতির পক্ষ থেকে হাশেম আলী খান প্রার্থী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল খান। হাশেম আলী খান কৃষক, ছাত্র, যুবক ও সাধারণ জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। কৃষক-প্রজা সমিতির কর্মী ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাঁর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালান। অপরদিকে মুসলিম লীগ চৌধুরী ইসমাইল খানকে সমর্থন জানায়। বরিশাল, কোতোয়ালী, নলছিটি, ঝালকাঠী, কাউখালী, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর, নাজিরপুর, বানারিপাড়া ও ভান্ডারিয়া নিয়ে তাঁর নির্বাচনী এলাকা। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে হাশেম আলী খান চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল খানকে পরাজিত করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[৩৫] এ বিজয় ছিল জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রজা সাধারণের আন্দোলনের বিজয়। নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখে তাঁর সদস্য পদের গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশিত হয়। এ নির্বাচনে বৃহত্তর বরিশাল থেকে হাশেম আলী খান, মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, ললিত কুমার বল, আবি আবদুল্লাহ (চাঁন মিয়া) ও বি. সি. চ্যাটার্জী আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ সালে নির্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রায় তিন বছর স্থায়ী ছিল। এ সময় হাশেম আলী খান আইন পরিষদে কৃষক প্রজার স্বার্থে আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রজা আন্দোলন ছিল বাংলার কোটি কোটি ক্ষুধার্ত, ঋণগ্রস্ত, জরাজীর্ণ কৃষকদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। বরিশালের অসহায় কৃষকদের নেতৃত্ব গ্রহণের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত হিসেবে তাঁর খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। দৃষ্টি এড়ায়নি ব্রিটিশ সরকারেরও। বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডনোভন হাশেম আলী

খানের ভূয়সী প্রশংসা করে হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত ও জনকল্যাণকামী নেতা হিসেবে তাঁকে "খান বাহাদুর" উপাধি প্রদানের সুপারিশ করে ব্রিটিশ সরকারকে পত্র দেন। ১৯৩৫ সালের ৩ জুন ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ওয়েলিংটন ভারতের শীতকালীন রাজধানী সিমলায় আনুষ্ঠানিকভাবে হাশেম আলী খানকে "খান বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।[৩৬]

বরিশাল জেলা বোর্ড ও হাশেম আলী খান

১৯৩৬ সালে খান বাহাদুর হাশেম আলী খান বরিশাল জেলা বোর্ডের[৩৭] চেয়্যারম্যান নির্বাচিত হন। কৃষক-প্রজা সমিতি ও কংগ্রেসের নেতা হিসেবে তিনি এ নির্বাচনে জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। জেলা বোর্ডের অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্য ছিল কৃষক-প্রজা সমিতির সমর্থক। তৎকালীন সময়ে ২৫ জন সদস্য নিয়ে জেলা বোর্ড গঠিত হতো।[৩৮] হাশেম আলী খান ১৯৩৬ হতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি বরিশাল জেলায় নতুন স্কুল নির্মাণ, রাস্তা ও পুল মেরামত এবং খাল পুনঃখনন করে উন্নয়ন কাজে দক্ষতার প্রমাণ রাখেন।

উপসংহার

বাংলার রাজনীতি যখন কলকাতা ও ঢাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল এবং নেতৃত্ব যখন জমিদার পুষ্ট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে ছিল তখন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তাঁর যে কয়জন একনিষ্ঠ সহকর্মীদের সহযোগিতায় রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে খান বাহাদুর হাশেম আলী খান ছিলেন অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। খান বাহাদুর হাশেম আলী খানের রাজনীতিতে আগমন ঘটে ছাত্র-অবস্থাতেই। বরিশাল জেলা স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে "বিলেতি দ্রব্য বর্জন" আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। হাশেম আলী খান কৃষক-প্রজার উপর জমিদার মহাজনদের নিষ্ঠুর অত্যাচার হৃদয় দিয়ে ভাবতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত কোনো দিনই বাংলার কৃষক-প্রজার মুক্তি হবে না। কংগ্রেস পুরাতন রাজনৈতিক দল হলেও সাধারণ কৃষক শ্রেণিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংগঠন হওয়ার কারণে দরিদ্র মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। মুসলিম লীগের রাজনীতি জমিদার নির্ভর হওয়াতে তারাও ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হতে চায়নি। এমনি পরিস্থিতিতে খান বাহাদুর হাশেম আলী খান প্রজাদের ওপর জমিদার মহাজনদের নিপীড়ন বন্ধ ও তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য স্বীয় জন্মস্থান বরিশালে ১৯১৫ সালে প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। পটুয়াখালীর সর্বত্যাগী বাণীকণ্ঠ সেন, গৌরনদীর দূর্জয় সাহসী মাজেদ কাজী, উকিল মফিজউদ্দিন, আগৈলঝাড়ার ভেগাই হালদার, কলসকাঠির হাশেম তালুকদার, উলানিয়ার কংগ্রেস কর্মী ওয়াহেদ রাজা চৌধুরী

ও কলসকাঠির মুন্সী মুহম্মদ ইয়ামীন হাওলাদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত প্রয়াসে তিনি বরিশালে শক্তিশালী রায়ত প্রজা আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। হাশেম আলী খান তাঁর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। হাশেম আলী খানের রাজনীতির মূল উৎস ছিল বাংলার চির অবহেলিত কৃষক সমাজ। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার জনগণ যখন ইংরেজদের শোষণ ও জমিদার মহাজনদের অত্যাচারে দিশেহারা তখন অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরিশালে খান বাহাদুর হাশেম আলী খানের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে দুর্বার কৃষক-প্রজা আন্দোলন। এছাড়াও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনসহ ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ প্রায় আটচল্লিশ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি বাংলার কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খেলাফত কমিটি, কৃষক-প্রজা পার্টিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। প্রায় ১২ বছর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হিসেবে হাশেম আলী খান অসংখ্য আইন প্রণয়ন ও আইন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। বরিশাল তথা বাংলার কৃষক সমাজের মুক্তি ছিল হাশেম আলী খানের জীবনের একমাত্র সাধনা।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. বরিশালের পূর্ব নাম চন্দ্রদ্বীপ। নবাব আলীবর্দী খানের সময় আগা বাকের খান বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের জমিদারি লাভ করেন। তিনি ১৭৪০ সালে সুগন্ধার শাখা নদী খয়রাবাদের তীরে একটি গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় নামে এর নামকরণ করেন বাকেরগঞ্জ। ১৭৯৭ সালে বাকেরগঞ্জ জেলা সৃষ্টি হয়। ১৮০১ সালে জেলার সদরদপ্তর বাকেরগঞ্জ হতে বরিশালে স্থানান্তর করে। বর্তমানে বরিশাল জেলায় মোট ১০ টি উপজেলা রয়েছে। উপজেলাসমূহ হলো: বাবুগঞ্জ, বরিশাল সদর, বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, হিজলা, মুলাদি, উজিরপুর, মেহেন্দীগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ। সূত্র ঃ মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা-উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭), ২৫৩-২৬০; সাইফুল আহসান বুলবুল, *বরিশালের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯), ৯-১৮; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, ষষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), ৩০০-৩০৩।

২. ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার শাহবাগে সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ উক্ত সম্মেলনে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গঠনের প্রস্তাব করেন। সভার সভাপতি নওয়াব ভিকার-উল-মূলক প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। এভাবে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ সৃষ্টি হয়। সূত্র: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), ২৭৬-২৭৮।

৩. ১৮৮৫ সাল ব্রিটিশ আই.সি.এস অফিসার অ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম এর উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে কংগ্রেস মুখ্য ভূমিকা

পালন করে। সূত্র: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ প্রথম খণ্ড* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), ২৮০।

৪. ১৮৮০ সালের ১৭ জুন বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীতে প্রথম বরিশাল বার সমিতি গঠন করা হয়। বরিশাল বার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ৪৩ জন। সূত্র: সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *হাশেম আলী খান* (ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৮৪), ৫৪-৫৬।

৫. কাজী মকবুল হোসেন,"হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত খানবাহাদুর হাশেম আলী খান", *সাপ্তাহিক খাদেম*, এপ্রিল ২১, ১৯৮৩।

৬. আহমেদ, *হাশেম আলী খান*, ১১৭।

৭. *প্রাগুক্ত*, ৩৫।

৮. ১৮২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর তদানীন্তন বরিশাল জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডবলিউ এন গ্যারেট জন বরিশালে প্রথম ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র আট জন ছাত্র নিয়ে বরিশালে ইংরেজি স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। ১৮৫৩ সালে স্কুলের ব্যয়ভার ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে এবং এরপর হতেই এই স্কুলের নাম হয় "বরিশাল জিলা স্কুল"। সূত্র: নাজিম ইদ্দিন আহমদ "বরিশাল জিলা স্কুলের ইতিবৃত্ত", *শতাব্দীর বন্ধন ১৭৫ বর্ষপূর্তি উৎসব-২০০৫*, (২০০৫) : ৩১।

৯. বরিশালে মুসলিম ছাত্রদের আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি হোস্টেল চালু করা হয়। ১৮৯৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মি. বেলের সভাপতিত্বে বরিশালে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় কলকাতা থেকে আগত নবাব সিরাজুল ইসলাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নামে এর নামকরণ করেন বেল ইসলামিয়া মুসলিম হোস্টেল। ১৯০১ সালে হোস্টেলের নির্মার্ণ কাজ শেষ হয় এবং গভর্ণর উডবার্ন হোস্টেল ভবন উদ্বোধন করেন। সূত্র: শ্রী সুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ, *বরিশাল বেল ইস্‌লামিয়া হোষ্টেল* (কলকাতা: মহামায়া প্রেস, ১৯৪০), ১-১৫ ; সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস* (ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ২০১০), ৬৩৫।

১০. খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন ছিলেন বরিশালের মুসলিম জাগরণের অন্যতম নেতা। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি লীগের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯১৩ সালে বরিশালে আছমত আলী খান ইনিষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি ১৯১০ সালে বরিশালে ইসলামিয়া আরবান কো-অপরেটিভ ব্যাংক এবং ১৯১৩ সালে সেন্ট্রাল কো-অপরেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দুই বার বরিশাল জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে খান বাহাদুর উপাধি প্রদান করে। সূত্র ঃ রুসেলি রহমান চৌধুরী, *বরিশালের প্রয়াত গুণীজন* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি বুক পাবলিশার্স, ২০০৬), ১৪০-১৪২।

১১. মাহমুদ ইউসুফ,"আধুনিক বরিশালের অন্যতম রূপকার খান বাহাদুর হাশেম আলী খান", *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, মার্চ ১৪, ২০০৬।

১২. হীরালাল দাশ গুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল* (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭), ৪৭-৪৯; মোঃ মনিরুজ্জামান শাহীন, "মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত: জীবন ও চিন্তা", *ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ ৫*, (২০১৭): ২৬৯-২৮৩।

১৩. তপংকর চক্রবর্তী, *অশ্বিনী কুমার দত্ত* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৮), ২৭; দেলওয়ার হাসান, "খান বাহাদুর হাশেম আলী খান স্মরণে", *সাপ্তাহিক কাগজ*, এপ্রিল ২৪, ২০০৬।

১৪. Mohammad Siraj Mannan, *The Muslim Political Parties in Bengal 1936-1947 A Study of their Activities and Struggle for Freedom* (Dhaka: Islamic Foundation, 1987), 66.

১৫. Humaira Momen, *Muslim Politics in Bengal : A Study of Krishak Praja Party and tha Elections of 1937* (Dhaka: Sunny House, 1972), 37.

১৬. মাহমুদ ইউসুফ,"আধুনিক বরিশালের অন্যতম রূপকার খান বাহাদুর হাশেম আলী খান", *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, মার্চ ১৪, ২০০৬।

১৭. হীরালাল দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, ৭৫।

১৮. *প্রাগুক্ত।*

১৯. আবদুল কাদের, *চিরঞ্জীব হাসেম আলী খান* (বরিশাল: কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, ১৯৬৭), ১৮।

২০. হীরালাল দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, ৭৮-৮০।

২১. কাদের, *চিরঞ্জীব হাসেম আলী খান*, ১৪।

২২. মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন (সম্পাদিত), *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস* (ঢাকা: আঞ্চলিক ইতিহাস ফাউন্ডেশন, ১৯৯০), ৫৪৮।

২৩. *Bangal Administrative Report 1925 – 1926,* Appendix –III.

২৪. কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ প্রথম খন্ড* (ঢাকা: ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৯৭৯), ৫৬-৫৭।

২৫. মনিরুজ্জামান শাহীন, *ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বরিশাল* ১৯২০-১৯৪৭ (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৭), ১০৯; আহমেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস*, ৬০৩-৬০৪।

২৬. আহমেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস*, ৬০৬; উদ্দিন, *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, ৫৫১-৫৫২।

২৭. মোহাম্মদ আবদুল বাতেন চৌধুরী, "বরিশালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও কুলকাঠি হত্যাকাণ্ড: একটি পর্যালোচনা", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩৯-৪০, (২০২১): ৭৫-৯০; কাদের, *চিরঞ্জীব হাসেম আলী খান*, ২১।

২৮. চৌধুরী, *বরিশালের প্রয়াত গুণীজন*, ১৩৫।

২৯. *Memorandum of Agreement and Declaration*, Barisal, 25 July 1928.

৩০. Md. Enamul Huq Khan, *A.K. Fazlul Huq and Muslim League in Bengal 1906- 1947* (Dhaka: Jahangirnagar University, 2002), 36-37.

৩১. আহমেদ, *হাশেম আলী খান*, ৮৭।

৩২. এ টি এম আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), ৪৩।

৩৩. উদ্দিন, *বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, ৫৫৫।

৩৪. মুহম্মদ আবদুল খালেক (সম্পাদিত), *শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক*, (ঢাকা: জ্যোতি-বরকত প্রকাশনী, ১৯৭৬), ৩০১; অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, *ভোলা জেলার ইতিহাস*, (ভোলা: মিসেস চাঁদ সুলতানা বুলবুল, ১৯৮৭), ২০০।

৩৫. ইউসুফ, "আধুনিক বরিশালের অন্যতম রূপকার খান বাহাদুর হাশেম আলী খান", *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, মার্চ ১৪, ২০০৬।

৩৬. *প্রাগুক্ত*।

৩৭. ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে গ্রামমুখী করার জন্য বৃটিশ সরকার ১৮৭৮ সালে "বেঙ্গল রোড সেস এ্যাক্ট" পাশ করে। স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল বাংলার ছোট লাট থাকা অবস্থায় ১৮৮০ সাল থেকে সেসবোর্ড গঠনের কাজ শুরু হয়। কিন্তু নানা সমালোচনার কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৫ সনে সেসবোর্ড রদ করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ করে। বাংলা প্রদেশে জেলা বোর্ডের প্রতিষ্ঠা তখন থেকেই শুরু হয়। ১৮৮৭ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর বাহাদুরের সভাপতিত্বে বরিশাল জেলা বোর্ডের কাজ শুরু হয়। ১৯১৮ সালে বরিশাল জেলা বোর্ডের প্রথম বাঙালী চেয়াম্যান হন চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল খান, এস, এম, ফজলুল হক চৌধুরী, ১৯৬৩, "বাকেরগঞ্জ জেলা কাউন্সিল ও স্বায়ত্ত্বশাসন", *বাকেরগঞ্জ জেলা কাউন্সিলের ১৯৬২-৬৩ সনের খতিয়ান*, বরিশাল জেলা কাউন্সিল কর্তৃক সম্পাদিত, ৯-১৩, বরিশাল: হাবিব প্রেস।

৩৮. আহমেদ, *হাশেম আলী খান*, ১১৬।